মৃদুল কুমার বাগচী স্মৃতি পুথিমালা
জ্ঞানগঞ্জ মাসিক পুথি ১৪ ।। জ্ঞানগঞ্জ আলাপ পুথি ২

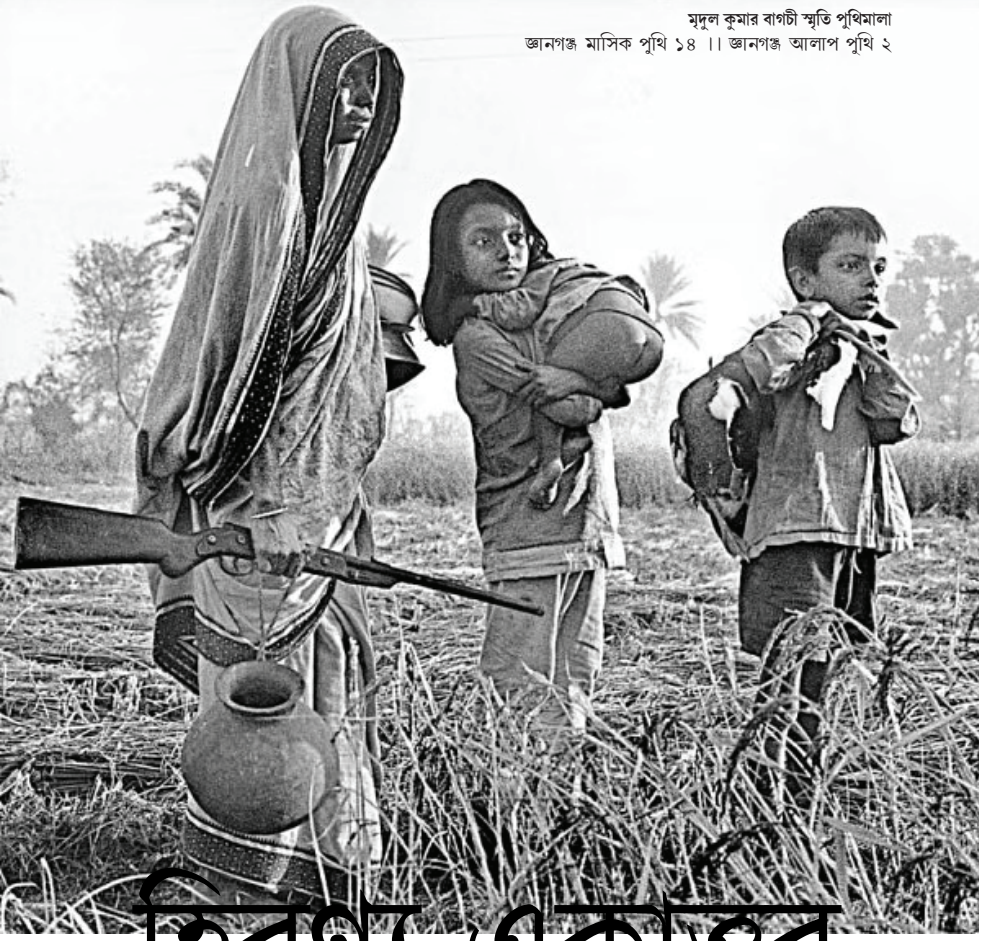

হিরণ্য একাত্তর

সৈয়দ নাকিব মাহামুদ

আলাপে
শিবদুতি মণ্ডল ।। অত্রি ভট্টাচার্য

জ্ঞানগঞ্জ,
উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা

হিরণ্য-একাত্তর
Hironyo-Ekattor
সৈয়দ নাকিব মাহামুদ
আলাপে শিবদ্যুতি মণ্ডল, অত্রি ভট্টাচার্য

১৭৭০/১১৭৬ গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার প্রকল্পের অধীনে জ্ঞানগঞ্জ ।। উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা, ৪ হিদারাম ব্যানার্জী লেন, কলকাতা - ৯ পক্ষে প্রকাশনা করলেন বিশ্বেন্দু নন্দ, বহ্নিহোত্রী হাজরা, অত্রি ভট্টাচার্য

ছাপা বাঁধাই আনন্দগোপাল হালদার, দেবাইপুকুর রোড, হিন্দমোটর, হুগলী

দাম ৫০ টাকা

কপিরাইট-মুক্ত প্রকাশনা

মৃদুল কুমার বাগচী স্মৃতি পুথিমালা

জ্ঞানগঞ্জের ১৪ তম পুথিটি প্রকাশ পেল, মৃদুল কুমার বাগচীর দুই মেয়ে, শিক্ষিকা শিরীন, আন্দোলনের কর্মী জগতির উদ্যমে। দুই বোনই জ্ঞানগঞ্জের শুভাকাঙ্ক্ষী। তাঁরা বাবার স্মৃতিতে জ্ঞানগঞ্জের আগামী এক বছরের পুথি ছাপার খরচ দিচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশের বহু বন্ধুর দানে এই অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম চলার পাথেয় খুঁজে নিয়েছে। জ্ঞানগঞ্জ প্রত্যেকের কাছেও কৃতজ্ঞ থাকল। শিরিন, জগতীর ভাষায় - **বাবা মুক্তি যুদ্ধের সময় ভারতে আসেন। তিনি আজীবন বলেছেন আমি ইস্ট পাকিস্তান থেকে এসেছি। কোনোদিন সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলির কথা আমাদের বলেনি। জীবনের শেষ ক'দিন রাজশাহীর বাড়ীতে নিজের হাতে তৈরি করা বাগানের কথা, সাধের সাদা গোলাপ গাছে বিকেলে জল দেওয়ার কথা বারবার বলতেন।**

জ্ঞানগঞ্জের পক্ষ থেকে হাত বাড়িয়ে দেওয়া শিরিন, জগতীর কল্যাণে তাঁদের বাবা প্রয়াত মৃদুল কুমার বাগচীর স্মৃতিতে যে পুথিমালা প্রকাশ করছি, সেই শৃঙ্খলার প্রথম বই মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা 'হিরণ্য একাত্তর'। এই সমাপতনে আমরা সকলেই উত্তেজিত। উপনিবেশের পতন হোক।

হে স্মৃতি, কথা কও

'মনে আছে একাত্তুরের/ বাংলাদেশে রক্তরোদন/ নদীর মাজা কাঁপিয়ে এলো/ স্বাধীনতার অকাল বোধন।/ ডালে ডালে পাতায় পাতায়/ সেই কি তোমার পাগলা নাচন/ এক পলকেই খসে গেলো/ হাজার সনের জরার বাঁধন।' - আহমদ ছফা

বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদ আকবর আলি খান 'বাংলাদেশের সত্তার অন্বেষা'য় আক্ষেপ করেছেন 'জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের (nation-state) ভুবনে বাংলাদেশের আবির্ভাব ঘটে বিলম্বে।' ১৯৭১ সালের ২৫-২৬ মার্চ রাতে, পাকিস্তানী সৈন্যরা 'প্রাদেশিক বিদ্রোহ' দমন করতে ঢাকায় তাদের ক্র্যাকডাউন শুরু করে। তারা কৌশলগত ভাবে বাঙালি জাতিসত্তার উদীয়মান মুক্তিচেতনার প্রতীকগুলিকে ধ্বংস করার জন্য দ্রুত ক্রিয়াশীল হয়। যদিও তারা প্রবল বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছিল, বিশেষ করে আধাসামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর) এবং পুলিশের থেকেও, যেহেতু উভয়েই মূলত 'বাঙালি'। তাদের অন্যতম টার্গেট ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। গ্রেফতার হওয়ার ঠিক আগে তিনি স্বাধীনতার একটি সংক্ষিপ্ত ঘোষণা লিখেছিলেন। যার সূচনা হয়েছিল অমরত্বকামী কিছু শব্দ দিয়ে: 'আজ থেকে বাংলাদেশ একটি সার্বভৌম ও স্বাধীন দেশ' এই ঘোষণার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম অবশিষ্ট 'উপনিবেশ', 'বাংলাদেশ' হয়ে উঠতে নিজেদের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করে। ২৮শে মার্চ ১৯৭১, ঢাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনসুল জেনারেল আর্চার ব্লাড, ওয়াশিংটন, ডিসি-র সেক্রেটারি অফ স্টেটের কাছে একটি গোপন টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন, 'সিলেক্টিভ জেনোসাইড' শিরোনামের সেই টেলিগ্রামটিতে ঢাকার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী নিয়ে আর্চার আতঙ্ক প্রকাশ করেন। কিন্তু, এটি মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির বিরোধী একটি বয়ান ছিল, কারণ তারা তখন প্রকাশ্যেই পাকিস্তান সরকারকে সমর্থন করছিলেন। আর্চারের টেলিগ্রাম তাদের এই সার্বিক গণহত্যা-সমর্থনকারী নীতিতে কোনো প্রভাব তৈরি করতে পারেনি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন এবং তার উপদেষ্টা হাজারো গণহত্যার ষড়যন্ত্রকারী, ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ সদ্যমৃত হেনরি কিসিঞ্জারের মধ্যে পরের দিন আর্চারের টেলিগ্রাফ বিষয়ে টেলিফোনে কথোপকথন হয়। সেই কথোপকথন খানিকটা অংশ এখনও জনপরিসরে মজুত রয়েছে, যা প্রমাণ করে সমগ্র মুক্তিযুদ্ধ-পর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাঙালি-নিধন যজ্ঞে সামিল হওয়া পাকিস্তান সরকারের পাশে ছিল। ঠিক যেভাবে আজ, এইমুহূর্তেও গাজায় বোমাবর্ষণ ও ওয়েস্টব্যাঙ্কের ফিলিস্তিনি জনতার উপরে ইজরায়েলের জায়নবাদী দখলদারিত্বের পক্ষে তারা প্রত্যক্ষ নিঃশর্ত সামরিক সাহায্য দান করছে, পরোক্ষভাবে বৈশ্বিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিবিধ কূটনৈতিক যুক্তি সাজাচ্ছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ— স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে 'একক' অর্থে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কালপর্ব। উপনিবেশের মুক্তিকামী জনতার 'জনযুদ্ধে'র মৌলিক প্রকৃতির প্রেক্ষিতে, এর রাজনীতি- আজ প্রায় 'পবিত্র' ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমে পর্যবসিত হয়িছে। তা সত্ত্বেও, ১৯৭১ সালের বাংলাদেশী স্বাধীনতার ঘোষণাকে ঘিরে বিতর্ক এবং বিতর্কগুলি মূলধারার রাজনীতিকে মেরুকরণের জন্য আজও ব্যবহার করা হয়ে। এই পুস্তিকাটি একরকমের মানব-অভিজ্ঞতার উপর গড়ে ওঠা 'মুক্তিযুদ্ধে'র একটি মৌলিক পাঠ, যাকে সময়ের স্মারক হিসাবে গ্রহণ করা হলে, যার উপর ভিত্তি করে মুক্তিযুদ্ধকে প্রকৃতই একটি 'জনযুদ্ধ' হিসাবে উপস্থাপন করা যায়। যুদ্ধ একটি সমাজকে বিভিন্ন স্তরে প্রভাবিত করে। যুদ্ধ, এমন একটি 'ঘটমানতা'র সময় যখন একটি সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন কার্যক্রম প্রায়শই স্থগিত হয়ে যায়— এবং পুরুষ এবং মহিলারা নিজেদের 'সমাজ' নির্ধারিত ভূমিকা পালন করেন না। বিশেষ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মতো একটি জনযুদ্ধে, যখন ছাত্ররা ও সাধারণ গার্হস্থ্য থেকে উঠে নারীরাও সৈনিক হয়ে ওঠেন। যুদ্ধ বয়ে নিয়ে আসে: প্রাণহানি, সম্পত্তির ক্ষতি, এমনকি মানুষের 'পরিচয়ের' বলয়েও সে ক্ষতিসাধন করে। জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভিন্নতা বয়ে আনে। সামরিক সহিংসতাও বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, যেমন: গণহত্যা, যৌন দাসত্ব, ধর্মীয় দমন

এবং প্রতিশোধমূলক হত্যা। এই যুদ্ধের এখনও পর্যন্ত কোনো 'সামগ্রিক' নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাস নেই, শুধু মাত্র পঞ্চদশ খণ্ডের নথির সংগ্রহ হিসেবে বাংলাদেশী স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র রয়েছে। একটি বিশ্লেষণাত্মক আখ্যানের অনুপস্থিতিতে, যুদ্ধের আবেগপূর্ণ বিষয়বস্তুর দিকটিই সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। তাই, স্বাধীন বাংলাদেশে, যুদ্ধটি এমন এক 'জাতীয়তাবাদী' আখ্যানে আবদ্ধ রয়েছে যা মূলত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে এক কৃত্রিমভাবে নির্মিত 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের' ইতিহাসের সাথে মিলিয়ে দেয়। অথচ, মুক্তিযুদ্ধ শুধু তাই নয়, মুক্তিযুদ্ধ এমন একটি ঘটনা যা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম রাজনৈতিক বর্গ 'বাঙালি'র মুক্তিকামী বাসনাকে ভৌগলিকতার উর্ধ্বে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ একটি নতুন সাহিত্য ধারার জন্ম দিয়েছে: তৎকালীন সময়ের পাকিস্তানি ও ভারতীয় সেনাকর্তারাও এখন তাদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার বিবরণ লেখেন। প্রতিটি যুদ্ধেরই নিজস্ব নীরবতা থাকে— সেই নীরবতা যা ধীরে ধীরে লেখকদের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে, চিৎকারে রূপান্তরিত হয়। পাকিস্তানী সেনা ও রাজাকার কর্তৃক বাঙালি নারীর ধর্ষণ-নির্যাতন প্রসঙ্গে দীর্ঘদিন অবধি ছিল এমনই এক 'হিরন্ময়' নীরবতা। যুদ্ধের এই দিকটি সম্পর্কে প্রথম ইঙ্গিতগুলো বড়ভাবেই ইতিমধ্যে নন-ফিকশনের চেয়ে বেশি ফিকশনে আবির্ভূত হয়েছে, মেয়েদের বয়ানেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস বেশিরভাগই গড়ে উঠেছে, বাঙালী জাতীয়তাবাদের নির্মীয়মান ইতিহাস ও ঐতিহাসিকতাকে ঘিরে। ফলস্বরূপ, পূর্ব-পাকিস্তানের বহু পার্বত্যনিবাসী ভূমিজ সম্প্রদায়ের মতো, অন্য অনেকের ভূমিকা এই ইতিহাস থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কিছু সমাজবিদ্যার পণ্ডিত ও রাজনৈতিক কর্মীরা একে সংশোধন করার চেষ্টা করছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে, পরিস্থিতি বিশেষভাবে জটিল ছিল কারণ রাজা ত্রিদিব রায়, চাকমা সার্কেলের প্রধান (পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি মহকুমার একটি) এবং এই অঞ্চলের সংসদ সদস্য, পাকিস্তানি বাহিনীর প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছিলেন। 'দ্য ডিপার্টেড মেলোডি' (২০০৩) স্মৃতিকথায় রাজা ত্রিদিব রায় সেই পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছেন যে কারণে তিনি ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে আনুগত্য করতে বাধ্য হন। অপারেশন সার্চলাইট— যা ছিল 'পাকিস্তানি' নাগরিকদের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যামূলক দমন-পীড়ন সর্বোচ্চ উদাহরণ। সেই হত্যাকাণ্ডে আটকে পড়া সাত বছর বয়সী এক শিশুর চোখের মাধ্যমে একে অনুভব করা যায়, অধীর চন্দ্র দে-র বয়ানে। তিনি তার পরিবারের রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দিয়েছেন। তার বাবা মধুসূদন দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে একটি রেস্টুরেন্টের (যা মধুর ক্যান্টিন নামে পরিচিত) এর মালিক ছিলেন। ছাত্র নেতারা রাজনৈতিক আলোচনার জন্য সেই মধুর ক্যান্টিনে ভিড় জমাতেন। আপাত বালক, অধীর চন্দ্র দে-র সেই বয়ানটি বাদ দিলে, এক নাবালকের হঠাৎ সাবালক হয়ে ওঠা চোখ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে দেখার বয়ান প্রায় বিরল। জ্ঞানগঞ্জের চর্চাদল, বন্ধু সৈয়দ নাকিব মাহমুদের কাছে কৃতজ্ঞ, তার অপরিসীম ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি আমাদের সময় দিয়েছিলেন, কলকাতার এক নিঝুম পানশালার নিভৃতকোণে তার মুখ দিয়ে আমরা শুনেছিলাম সেই দ্রোহকালের বাখান। যখন তিনি তার শৈশবে, বুঝতে শেখেননি বিদ্রোহী অন্তর্ঘাতের অর্থ, কয়েক মাসের ব্যবধানে তার অস্তিত্বের অর্থ বদলে গিয়েছিল, অজান্তেই সেই 'পাকিস্তানী' কিশোর হয়ে উঠেছিল এক 'বাঙালি' নাগরিক। আমরা আশা রাখব, মুক্তিযুদ্ধ-সাহিত্য নামক লিটারারি জঁরটির বিপুলায়তন সমাহারে সৈয়দ নাকিব মাহমুদের এই বয়ান দীর্ঘজীবী হবে।

অত্রি ভট্টাচার্য

কৈশোর-স্মৃতি : মহাকাব্যিক মুক্তিযুদ্ধ

প্রকৌশলী সৈয়দ নাকিব মাহামুদ, জন্ম ও বেড়ে ওঠা ঢাকায়। লেখাপড়া ঢাকা ও ভারতের এলাহাবাদে, যশোর অঞ্চলে রসবতী খেজুরগাছ নতুন করে আবিষ্কার করেছেন। এর সাথে সাথী ফসলের আবিষ্কারও করেছেন, এই সাথী ফসল হচ্ছে খেজুরের বাগানে নানা রকম ফসল । যা অন্য ক্ষেত এ করা ফসলের তুলনায় লাভ জনক। তৈরী করে চলেছেন নানাবিধ যন্ত্র এই যেমন— ক্লাইমবার, যাতে চড়ে ওঠা যায় তাল নারকেল সুপারী গাছে; কিংম্বা ধানকাটার মেশিন। এই দুই পদের যন্ত্রই সুলভ দামে কৃষক বা প্রান্তিক মানুষের হাতের নাগালে এনেদিয়েছেন তিনি। অসম্ভব আগ্রহ ইতিহাস পাঠে ও দর্শনে। নিজেকে বলেন ইতিহাসের ছাত্র। এই ইতিহাসের ছাত্রের সাথে আলাপচারিতায় ছিলেন জ্ঞানগঞ্জের পক্ষে শিবদ্যুতি মণ্ডল, অত্রি ভট্টাচার্য। সহায়তা বিশ্বেন্দু নন্দ ।

আপনার তো শৈশবকালে মুক্তিযুদ্ধ ঘটছে, তাহলে মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক স্মৃতি বলতে আপনার কি মনে পড়ে?

২৫শে মার্চ রাত্রে যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়, সেই সময় আমার বয়স পাঁচ বছর দুই'মাস এক সপ্তাহ। এটা একেবারেই পাঁচ বছর বয়সী শিশুর চোখে ঢাকা শহরে মুক্তিযুদ্ধের খন্ডচিত্র ঘটনাটা শুরু করবো আরও আগে থেকেই, আমার মনে পড়ে ১৭ অথবা ১৮ মার্চ আমরা করাচি থেকে প্লেনে করে ঢাকা ফিরছিলাম। গোটা প্লেনে একমাত্র সাধারণ জনগণ আমরাই ছিলাম- আমি আমার বাবার কোলে; আমার বোন আমার মায়ের কোলে (বাবার লন্ডন অফিস থেকে ইস্যু করা টিকেট ছিলো, না হলে জনসাধারনের জন্য তখন কোন টিকেট দেওয়া হচ্ছিলো না।) বাকি গোটাটা প্লেনে কেবল ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী; নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম পরা, রাইফেল

হাতে হেলমেট পরে তারা বসে ছিল। সেই বয়সের উন্মাদনাবশত উত্তেজিত আমি, সকলকে বারেবারে স্যালুট করছিলাম,(আমার মা ব্যাপারটা নিয়ে বেশ আতংকিত হচ্ছিলেন যা পরে মায়ের মুখে শুনেছি)তারাও আমাকে প্রত্যুত্তরে স্যালুট করছিল — আসলে এই সেই মুহূর্ত যা পরবর্তীতে বুঝেছি, ওইদিন তারা আমার দেশের বিরুদ্ধে আসছিল। প্রতিটা প্যাসেঞ্জার ফ্লাইটে শয়ে শয়ে সৈনিক আসছিল।

এরপরেই সেইদিন অর্থাৎ ২৫শে মার্চের রাত, আমার খালাতো বোনের জন্মদিন ছিল। দিনেরবেলা বাবা অফিসে যাওয়ার সময়ে খালার বাড়িতে আমাদের নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। মা আপুর জন্মদিনের উপহারে বেশ রঙিন একটি শাড়ি কিনেছিলেন, পরেরদিন জন্মদিনের দাওয়াতে বাবা-মা আসবে বলে খালু আমাকে আটকে দেয়। সেই ২৫তারিখ রাত্রেই প্রথম ক্র্যাকডাউনটা হয় — অনবরত রাতেরবেলা ম্যাগ্নেশিয়াম ফ্লেয়ারগুলোর নিক্ষেপন চলে। মেরুন রঙের মধ্যে; গ্রেনেডের লাল আভা; মেশিনগানের আলো। আমার

খালার বাড়ী ছিলো সেগুন বাগিচা আর আলোর ওই বিচ্ছুরন আসছিলো যেদিকে রাজারবাগ পুলিশলাইন সেদিক থেকে আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক থেকে। শব্দ ও আলোর যুগলবন্দীতে আকাশে এক বিচিত্র চিত্র তৈরি হচ্ছিল। সকলে তখন ভীত হয়ে বসে আছে, সেই সময় আমি আচমকা আপুকে বলে উঠি, 'একটা সিক্রেট

আছে, মা তোমার জন্য উপহারে যে শাড়িটা এনেছে সেটা একেবারে এই রঙের।' এরপরে যুদ্ধের অনেক খণ্ড খণ্ড ঘটনা মনে রয়েছে, যা কোনোদিনও স্মৃতি থেকে মুছে যাবে না।

যেমন ধরুন, ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স থেকে কাগজ ফেলে আত্মসমর্পণ

করার জন্যে। আমাদের একজন বাজার সরকার ছিল নাম জব্বার, তখনকার দিনে তো যৌথ পরিবার। সকলের ফরমায়েশ অনুযায়ী সে একটা লিস্ট বানিয়ে বাজার এনে দিত। একদিন এরকম আত্মসমর্পণ করার কাগজ পড়েছে, প্রথম প্রথম তো সবাই খুব অবাক হত। তারপর একদিন কারফিউ ওঠে, সরকারের তরফ থেকে খিদা নিবারণের জন্য বনপাউরুটি দিচ্ছিলো। যে যতগুলো রুটি পেরেছে নিয়ে এসেছে, টেবিল উপচে পড়ছে রুটিতে। জব্বার ভাই (বাজার সরকার) তখন রেশন দোকান দিয়ে ফেরত আসেন টেবিল ভর্তি রুটি দেখে চমকে উঠে প্রশ্ন করেন এত রুটি কোথা দিয়ে এলো! বাবা তখন উত্তরে বলেন, 'কেন প্লেন থেকে পড়লো তো তুমি কুড়োয়নি?' (বলে রাখা ভালো আমার আব্বা ছিলেন ভীষন রসিক মানুষ যেকোন পরিস্থিতি সামলে নিয়ে মানুষকে হাসাবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিলো তাঁর । তাঁর মৃত্যুর ছাব্বিশ বছর পরও তার পরিচিত বন্ধু , আত্মীয় পরিজন আজও তাঁর এই গুনের কথা মনে করে এবং

সেই সব হাস্যরসাত্মক সময়কে মনে করে হাসে ।)জব্বর ভাই তখন বলেন, না আসলে আমি তো ভয়ে রেশন দোকানের ভিতরেই বসেছিলাম। আসলে এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও এই খোরাকগুলো কমিক রিলিফের মতন কাজ করত। আরও বললে বলতে হয় যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমরা বাড়িতে কেমন করে দিন কাটাতাম; সেও এক আশ্চর্য দিনযাপন। আমরা বাড়িতে কেউ হাঁটতাম না, হামাগুড়ি দিতাম। খাটগুলো ইট দিয়ে জানলার বেদি বরাবর উঁচু করে রাখা হয়েছিল। বাড়ির দোতলায় কেউ যেত না; দোতলা সম্পূর্ণ গুলিবিদ্ধ — ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল, ক্রস ফায়ারিংয়ের গুলি-সেল ইত্যাদি খুঁজে পাওয়া যেত। খুব স্পষ্টভাবে বললে, সেইসময় দোতলায় মৃত্যু অনিবার্য ছিল। নীচ তলায় হামাগুড়ি দিয়ে হাটতে হতো । খাটের তলায় থাকতাম আমরা । মনে হত যেন সকলে মিলে ঘোড়াঘোড়া খেলি; মাও খেলছে-বাবাও খেলছে; আমরাও খেলছি। অনেকদিন পর 'লাইফ ইজ বিউটিফুল ' সিনেমাটি দেখে আমার মুক্তিযুদ্ধের দিন গুলোর কথা মনে পড়েছিলো । সিনেমার ওই শিশুটি থেকে বেশ

একটু ছোটই ছিলাম কিন্তু আসলেইতো ওই রকম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েই গিয়েছিলাম। আসলে বাঙালীর জীবনে সবচেয়ে বড় এপিক হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ ।

যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের এই দীর্ঘদিনগুলি খাবারের জোগান কীভাবে পেতেন?

একটা যুদ্ধের সময় আর দশটা দেশে যেমন হয়, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। বাজার দিনের পর দিন বন্ধ থাকতো, কোথাও আলাদা করে কিচ্ছু নেই। ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ পাকিস্তান থেকে মাঝে মধ্যে কিছু খাবারের সাপ্লাই আসত, বাকি যে যার গ্রামের যোগাযোগ সুত্রে অন্নের জোগাড় করত। মানুষ কেবল কারফিউ উঠলেই বেরুতে পারত, সেইসময় একটা কারণেই সকলে বাইরে যেতেন তা হলো খাবার সন্ধানে । হঠাৎ করেই খবর ছড়িয়ে যায় যে নুডলস এসেছে। তখনকার দিনে তো প্লাস্টিকের চল অতটা ছিল না, ওয়াক্স পেপার পাওয়া যেত। হারমিনায়েম মতন কাঠের বাক্সে এক একটা ওয়াক্স

পেপারে এক পাউন্ড করে নুডলস/চাউমিন এসেছে। বাবা বেশ অনেকগুলো প্যাকেট নিয়ে এসেছিল, প্রথম কয়েকদিন তো খুব মজার সাথেই চাউমিন খাওয়ার পর্ব চলছিল কিন্তু তারপরে বিতৃষ্ণা তৈরি হতে শুরু করলো। বাসায় আমাদের একজন কাজকর্মের মহিলাও থকাতেন, নাম ছিল হাজেরা। হাজেরা খালা মাকে বুদ্ধি দিয়েছিলেন, চাউমিনগুলিকে ভাতের আকারে কুচিকুচি করে কেটে রান্না করার। বহুদিন পরে, বাড়িতে ভাত দেখে বোন খুব খুশি হয়ে খেতে গিয়ে আবিস্কার করে আসলে এগুলো সবই নুডলস। দিনের পর দিন এই একই খাবার খাওয়ার স্মৃতি আজও আমাকে তাড়িয়ে বেরোয়, এখনও জীবনে একান্তই ঠেকা না পরলে আমি চাউমিন অথবা নুডলস খাইনা। এই স্মৃতি একধরণের ভীতির সঞ্চার ঘটিয়েছে। এসময়ে আমাদের পাশের বাড়ীর আরেফ ভাইরা সবাই বাড়ী ছেড়ে পালায় । ওদের দুটো পোষা মুরগী ছিলো । মুরগী গুলো যত্রতত্র ডিম পেড়ে বেড়াতো । আমাদের কাজের ছেলে সেই ডিম কাঁচা খেতো । ওর দেখাদেখি আমিও একদিন সেই কাঁচা ডিম খাই ।

এইভাবে চলতে চলতে ৪ঠা জুলাই (সম্ভবত) আমাদের সাদা বেবি

Female Muktijuddhas teaching local women to use rifles (1971). Photo courtesy: Unknown

ফিয়াট গাড়ীটা মুক্তিযোদ্ধারা নিয়ে গিয়েছিলেন, নেবার সময় তারাই বলেছিলেন পুলিশে রিপোর্ট করতে । পুলিশের কাছে রিপোর্ট লেখাতে গিয়ে দেখাগেলো, তারা মুক্তিযোদ্ধাদের ডাকাত বলে সম্বোধন করছেন। সেই গাড়ি ব্যবহার করে ডিনামাইট বিস্ফোরণ করে মুক্তিযোদ্ধারা জানান দেন যে, ঢাকা শহরেও তারা আছেন। সাধারণ মানুষের কাছে খোঁজ থাকত, শুধু কাউকে বলা যেত না। আরও একটা মজার ঘটনার কথা মনে আসছে, একজন ব্রিটিশ ভদ্রলোক ছিলেন নাম হল মিস্টার টোনি গ্রেগ। আমার বাবার বস ছিলেন। শেরাটন হোটেলে মুক্তিযোদ্ধারা একদিন গ্রেনেড চার্জ করেন। টোনি গ্রেগ সেইসময় ওইখান দিয়ে পাশ করছিলেন,

ঘটনাসুত্রে ওনার গাড়ির গ্লাসটা ভেঙে যায়। প্রাথমিকভাবে উনি ভাবেন যে আওয়াজের চোটেই কাঁচ ভেঙে গিয়েছে। পরে অফিসে পৌঁছে উপলব্ধি করেন যে ওনার বুকপকেটের রনসন লাইটারের গায়ে স্প্লিন্টার লাগানো রয়েছে।

আর একটা বিষয় মনে পড়ছে, সেই সব দিনে মা আমাদের আটা দিয়ে আঠা বানিয়ে দিতেন। আমাদের সেইসময় একটা পছন্দের কাজ ছিল, ওই আঠা দিয়ে জানলায় কাঁচের উপর ক্রস করে কাগজ সাঁটানো। অনবরত গুলির বর্ষণে নয়তো সব কাঁচ ভেঙে যাবে। সেও যেন এক খেলার অংশ ছিলো ।

যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আপনাদের প্রাত্যহিক জীবন কেমনভাবে অতিবাহিত হত?

একটু আগেই বলছিলাম, যে সারাদিন ঘোড়াঘোড়া খেলতাম। কারফিউ ভাঙলে বাবা কেবল অফিসে যেতেন। সেই দিনগুলো মা চিন্তা করে একেবারে অস্থির হয়ে উঠতেন।

আপনার বাবার কোথায় কাজ করতেন?

আমার বাবা পাটের কাজে পারদর্শী ছিলেন। লুই ড্রেফার্স নামে একটি ব্রিটিশ ফরাসী কোম্পানীর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন ।

যুদ্ধের সময় এনাদের চলাচলের ক্ষেত্রে স্পেশাল পারমিশন থাকতো?

হ্যাঁ, পাকিস্তান আর্মির কাজ থেকে স্পেশাল আইডেন্টিটি কার্ড বরাদ্দ করেছিলো অফিস কর্তৃপক্ষ। সহজ বাংলায় এটা ছিল কারফিউ পাস। মুক্তিযুদ্ধের সময় সবচেয়ে প্রথম গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আমার বড় চাচাকে(জ্যাঠা), তিনি ছিলেন ন্যাশেনাল সিকিউরিটি ইন্টালিজেন্সের ডাইরেক্টর জেনারেল ও এডিশনাল ইনস্পেকটার জেনারেল অফ পুলিশ ছিলেন। ওনার নাম হল সৈয়দ নাসিরুদ্দিন মাহমুদ। বঙ্গবন্ধুকে যেদিন গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, সেই একইদিনে আমার চাচাকেও হাউস এরেস্টে রাখা হয়। টেলিফোনের লাইন কেটে দেওয়া হয়, সকালবেলা আর্মির গাড়ি আসত ওনাকে নিয়ে পুলিশ হেড কোয়ার্টারে নিয়ে চলে যেতেন। সারাদিন সেখানে চলতো জিজ্ঞাসাবাদ। বিকেল হলে বাড়িতে আর্মির গাড়ি এসে নামিয়ে দিয়ে লক করে চলে যেত। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমাদের কারোর সাথে ওনার কোন যোগাযোগ ছিল না।

আপনি যে বলছিলেন আপনাদের ভিটে মাটি ছেড়ে চলে যেতে হয় একটা

সময় পরে, সেই সূত্র ধরেই যদি বলি এই নিজের ভূমি থেকে স্থানচ্যুতি আপনার শৈশব, পরিবারে কীভাবে প্রভাব ফেলেছিল? অথবা এই যে ঘোড়ার মতন করে বাড়ির ভিতরে প্রাণের তাগিদে বিচরণ করতে হত, যুদ্ধের দেশে মানুষের ব্যক্তিগত পরিসরেও যে বেঁচে থাকার যুদ্ধ চলে তা আপনার শিশুমনে কি প্রভাব রেখে গিয়েছে?

যুদ্ধের সময় আমার বড় চাচী মারা যান । ওনার কয়েক জন ডাক্তার চিকিৎসা করতেন তারমধ্যে একজন ছিলেন শহীদ বুদ্ধিজীবি ডাঃ রাব্বী । চাচী মারা যাওয়ার পরে তার দুই মেয়েকে মা আমাদের সাথেই থাকতে বলেন। বড় চাচা ও চাচীরর চার কন্যা ছিল; দুইজনের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল ও বাকি দুজন তখনও কুমারি ছিলেন। স্থানচ্যুতি প্রসঙ্গে সব থেকে বড় চিন্তার মুহূর্ত তৈরি হয়েছিল বাড়িতে যখন শামিমা আপুকে বাঁচানোর জন্য কলকাতা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। ঢাকা থেকে কলকাতা পৌঁছাতে আপুর মোট সাতদিন না দশদিন সময় লেগেছিল, পায়ে হেঁটে নৌকায় চেপে অবশেষে ইন্ডিয়া বর্ডার পার করতে পেরেছিল। এই ক্ষেত্রে কাজটি খুবই ঝুকিসম্পন্ন ছিল কারণ শামিমা আপু তখন বিবাহযোগ্যা। আমাদের পরিবারের মধ্যে তখন ভীষণ অস্থিরতা কাজ করছিল, বয়সের কারণেই শামিমা আপুর

ঠিক কি হয়েছে তা বুঝে নেওয়া সম্ভব ছিল না।

১৪ই ডিসেম্বর আমরা বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলাম, বিজয় দিবসের ঠিক দুদিন আগে। ১৩ তারিখের রাতের বেলায়, আমাদের বাড়ির কাজের ছেলেটি হঠাৎ করে কতগুলো গ্রেনেড নিয়ে বাসায় হাজির হয়েছে। বলে মিলিটারিরা নাকি পালিয়ে গিয়েছে। আমাদের বাড়ির পাশেই একটা আউটপোস্ট মতন ছিল, সেখানে আট দশজন পাকিস্তানি আর্মি থাকতো। ওখানে গিয়ে দেখা যায় যে ওরা ইউনিফর্ম আর্মস সব কিছু ফেলে রেখে পালিয়ে গিয়েছে। তখন বাবা বলে ওঠেন, এইমুহূর্তটা খুবই বিপদজনক। এর আগে কয়েকবার বিহারিরা হামলা চালিয়েছিলো,তখনও আর্মিরা টিকে ছিল এখন তারা পলাতক সুতরাং সেই মুহূর্তের পরবর্তী সময়ে কি হবে কারা আসবে তাদের থেকে কীভাবে আত্মরক্ষা করা যাবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় কাজ করছে। কারন পরিস্থিতি টের পেয়ে অনেক পাকিস্তানী দোসর রাতারাতি ভোল পালটাতে শুরু করে দিয়েছে । এদিকে আমাদের পরিবারের অনেকে মিলিটারীদের কাছে বন্দী , আমার তিন মামা পাকিস্তানে বন্ধী । বড়চাচার কোন খোঁজ নেই ।২৫শে মার্চ রাত্রে যখন অপারেশন সার্চ

লাইট চলছিল, তিনটি জায়গায় ওরা গিয়েছিল — ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা পুলিশ লাইন আর পিলখানায় বর্তমানে বিজিবি হেড কোয়ার্টার ।এই তিনটি জায়গাকে ঘেরাও করা হয়েছিল, চলে অনবরত মেশিনগান গ্রেনেডের লড়াই। ওখানে হিন্দু মুসলিম বাছাইকরণের সময় ছিল না, ওই একরাতেই তিরিশ হাজার মানুষ মারা গিয়েছিলেন। সবসময়ই অবাঙালিরা নানা রকম ঝামেলা করেছে।পাকিস্তান আর্মি চক্ষু লজ্জাহীন ভাবে চেষ্টা করেছিল পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক দেখানোর। কাজ না থাকলেও সার্ভিসম্যানদের অফিসে গিয়ে বসে থাকতে হত। পরে শুনেছি তাদের এই অফিসের প্রতিটা মুহূর্ত নাকি ছিলো ফাঁসির মঞ্চে বসে থাকার মত । আব্বা যখন বাইরে যেতেন আমার মায়ের অবস্থা তখন হতো ফাঁসির মঞ্চে বসে থাকার মত সদা বিড়বিড় করে প্রার্থনা করতেন ।

দেশভাগের স্মৃতি কিংবা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি কোনোটাই সিনেমায়

যেমন করে ফুটিয়ে তোলা হয় সেইরকম নয়। করোনা মহামারির সময় যেমন লকডাউন চলতো, কারফিউয়ের দিনগুলো প্রায় একইরকম ছিল। দোকানপাট, বাজারখোলা সবই খোলা থাকত, শুধু রাস্তায় মানুষ থাকত না। প্রথমদিকে কেউই ভিটেমাটি ছেড়ে কোথাও যাওয়ার কথা ভাবেননি, পালানো আরম্ভ হয় যখন প্রথম ক্র্যাকডাউন হয় ২৫শে মার্চ। মানুষ তখন আতঙ্কে পালানো শুরু করে। ভাবুন পরিবার পরিজন নিয়ে মানুষ শহর ছাড়ছে , যে শহর ছেড়ে তারা যাচ্ছে পথে পড়ে আছে লাশ , মানুষের লাশ ।

আর ঢাকার বাইরে, সেই সময় অবধি আতঙ্ক ছড়ায়নি ?

ঢাকার বাইরে জেলা শহর গুলোতেও একই সময় শুরু হয়, গ্রামের দিকে কিছুটা পরেই হবে। মুক্তিবাহিনী যখন তাদের অস্তিত্ব জানান দেয়, তখনই হানাদাররা পাগল হয়ে যায়। পাকিস্তান আর্মি তখন তাদের খোঁজা শুরু করে। মুক্তি বাহিনী সাধারণত পাকিস্তান আর্মির ক্যাম্পে আক্রমন করতো বা তাদের গমন পথের কোন ব্রীজ উড়িয়ে দিতো । তখন তারা ভয়ে চারিদিকের গ্রামগুলিতে সেলিং করা শুরু করে। ওই এলাকার হাজার হাজার মানুষ তখন দিকশূন্যভাবে পালাতে

আরম্ভ করলো। তারপর খবর ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো যে এই গ্রামে সেলিং হয়েছে, ধীরে ধীরে একগ্রাম থেকে অন্যগ্রাম পালানোর প্রক্রিয়া চলতে লাগল।

যুদ্ধ অন্তর্বর্তী সময়ে একটি দেশে দুভাবে প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, একরকম হল বহির্মুখী জীবন ও অন্তর্মুখী জীবনে। আপনার অন্তর্মুখী জীবনে পাঁচবছর বয়সের স্মৃতি থেকে এমন কিছু মনে পড়ে?

কিছু টুকরো টুকরো ঘটনার উল্লেখ তো ইতিমধ্যেই করেছি। এছাড়াও যদি নির্দিষ্টভাবে সামগ্রিক চিত্র বলতে হয়, তাহলে যা মনে আসে সেটা হল সেই সময় কারোর মুখে হাসি আনন্দের লেশমাত্র থাকত না। সেই সময়কাল জুড়ে কেউ হাসত না। একটা আশ্চর্যকর ঘটনা এই প্রসঙ্গে মনে আসছে, আমাদের সম্প্রদায়ে মুসলমানি (খতনা) হয়। পাড়ায় যে ভাইয়েদের বয়স হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মুসলমানি হয়নি, সেইসময় গণহারে মুসলমানি হতে শুরু হয় পাড়ায় পাড়ায়। যুদ্ধের মধ্যে এই কার্যকলাপ রুপকশোভিত। মানুষ আতঙ্কের বশবর্তী হয়ে কি কি ধরণের কাজ করছিল সেই সময়, এই ঘটনা তারই একটা ছোট উদাহরণমাত্র।

আপনারা পালিয়ে যখন বাইরে যাচ্ছেন, সেখানে গিয়ে কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন?

যেদিন আমরা পালালাম, মা-বাবা রাতের বেলা কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে সোনার গয়না, মুল্যবান জিনিস কবর দিয়ে দেন। পালানোর পথে লুটেরাদের হাত থেকে বাঁচার তাগিদে। ১৭ই ডিসেম্বর আমারা তিনদিন পরে যখন বাসায় ফিরলাম, আমার অনেক খেলনা ছিল, তার কোনো একটাও আর খুঁজে পায়নি। সেই সময় আমি খেলনার শোকে কাতর হয়ে পড়ি। তবে পরবর্তীতে যখন সেই সময়ের স্মৃতি ভাবতে বসি, মনে পড়ে আমাদের বাড়িতে বিভিন্ন ভাষার বেশ কিছু পুঁথি ও দুর্লভ বই ছিলো সেইগুলো কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। সেসবই আমার দাদার কালেকশন ছিল, সব জায়গাতেই পাকিস্তানীরা বই পুড়িয়েছে মনের আনন্দে । শুনেছি আমার নানা শ্বশুরের এক ঘর বই পুড়িয়ে দিয়েছিলো । তিনি খুব বিদগ্ধ মানুষ ছিলেন, কর্ম সূত্রে অন্নদা শংকর

রায়ের ব্যাচমেট ছিলেন । ওই সময় আমি কেঁদেছিলাম খেলনার জন্য, এখন প্রতি মুহূর্তে আফসোস করি সেই পুঁথিগুলির জন্য। হয়তো সেই একঘর বই হারিয়ে যাওয়ার স্মৃতি আমাকে আজও তাড়িয়ে বেড়ায়, তাই আমি সারাজীবন প্রচুর বই কিনেছি ও একঘর ভর্তি বই আজ আমার আছে।

যুদ্ধ পরবর্তী জীবন নিয়ে যদি কিছু কথা ভাগ করে নিতেন!

যুদ্ধের পরে তো আমাদের যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যায়। সম্পূর্ণ নতুন একটি জীবন, পরিবেশ স্কুল — সবই নতুন সাথে ছিল একটা নতুন দেশ। একদিকে যেমন ছিল বেদনা, অন্যদিকে নতুন দেশ পাওয়ার উন্মাদনা। আমাদের বয়সীদের কাছে বেদনার চাইতে নতুন দেশের আস্বাদ অনেক বেশি কাঙ্খিত ছিল। বেদনাটা তখনও আমরা বুঝে উঠতে

পারিনি। আমার মনে বেশ বয়সকাল অবধি একটি প্রশ্ন ঘোরাঘুরি করেছে অনবরত যে যুদ্ধের সময় শামিমা আপু কেন এত বড় ইস্যু ছিল! তাকে যে ধরে নিয়ে যেতে পারে, নিয়ে গেলে তার সাথে কি কি ঘটতে পারে তা সম্পর্কে তেমন স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

আপনার বাড়িতে কি কেউ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন? যদি না থাকে এমন কি কখনো হয়েছে যে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী বাড়িতে তল্লাশি করতে এসেছিল?

আমার বাড়ির বাইরের কোণেই পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর আউটপোস্ট ছিল। সামনে খালি মাঠ থাকত, সেখানে অ্যান্টি এয়ারক্রাফট ট্যাঙ্ক বসানো ছিল।আর্মিরা বসে থাকত, যখন এই অঞ্চলে ক্যাম্পটি গড়ে ওঠে সেই মুহূর্তেই গোটা অঞ্চল ঘুরে রেকি করে তারপর ক্যাম্প গঠন করা হয়েছিল। সেই সময় তো তল্লাশি চলেছে নিরন্তর। আমার পরিবারের প্রথম ভাষা শহীদ আমার মামা শহীদ বরকত, ১৯৫২ সাল। এরপরে

যুদ্ধের সময় আমার আত্মীয় সুত্রের ভাইবোনেরা যারা মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুক্ত ছিল, রাতের অন্ধকারে বাড়ির পিছন দিয়ে এসে খাবার খেতো । ওই রাতে তখন ভাতের ফুটন্ত গন্ধ নাকে আসত। পরে শুনেছি খাবারের সাথে তারা খবর সংগ্রহের জন্য আসতো ।

আপনার শামিমা আপু বাদেও তো আরও অনেক পরিচিত মহিলারা তো পালিয়েছিলেন, সেই পথে আটক হওয়া বা বিপদের মুখে পড়েছিলেন কেউ তার কোন স্মৃতি কিংবা সেই বিপদ থেকে তারা কিভাবে বেঁচে পালিয়েছিলেন সেইরকম কিছু যদি বলতে পারেন?

সেই দিন রাস্তা পুরো ফাঁকা ছিল। সেইদিন জীবনে প্রথম আমার মা বোরখা পরেছিলেন। আমি তো হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম।গাড়ির কাঁচ মাটির প্রলেপ দিয়ে ঢাকা থাকত যাতে গাড়ির ভিতরে মহিলা আছে কিনা তা যেন শনাক্ত করা না যায়। হঠাৎ করে পাকিস্তানি আর্মি রাতে ক্রস ফায়ারিং করত, গুলির শব্দে আমি ও বোন কেঁপে কেঁপে উঠতাম। নানা বোনকে সেই সময় চেপে ধরে রাখতেন। এমনটা রোজ রাতে

হত, বোন রোজ রাতে অমন থরথর করে কাঁপত। দীর্ঘদিন এমন হতে হতে আমাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল ততদিনে আমরা আর গোলাগুলিকে ভয় পাই না তখন আক্ষরিক অর্থ আমরা বীর বাঙালী ।তখনকার ঘটনা হলো ডগ ফাইট; যেদিন ইন্ডিয়ান বিমান বাহিনী আসে। ততদিনে আমরা আর গোলাগুলিকে ভয় পাইনা। তখন আমরা ছাদে সিনেমার মতন দেখতাম যে একটা ফাইটার প্লেন অন্যটাকে ধাওয়া করছে; বাড়ির বড়রা চিৎকার করে নীচে নেমে আসার জন্য ডেকে যেতেন। আমরা তখন অকুতোভয়ে সেসব দেখতাম। ধুম ধুম করে ঢাকা এয়ারপোর্টের রানওয়েতে ইন্ডিয়ান বিমান বোমাবর্ষণ করছে। আমাদের ভয় তখন শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা জেনে গেছি মুক্তিবাহিনীর সাথে ইন্ডিয়ান আর্মিও যোগ দিয়েছে ।

শেষ দিনের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?

১৬ই ডিসেম্বর। আমার একটা ছবি জাতীয় জাদুঘরে আছে। স্বাধীনতার দিন

বড়খালুর কাঁধে বসে ছিলাম আমি।হাজার হাজার লোক রেসকোর্স ময়দানে। আমি শুধু দেখছি হাজার হাজার মানুষ । আর খুব ভালো লেগেছিলো পাগড়ী পরা ইন্ডিয়ান সেই মিলিটারীকে আমার মতন পাঁচ বছরের বাচ্চার যদি ভয় কেটে গিয়ে থাকে, আমার চাইতে বয়সে বড়রা তখন ভয়কে জয় করে ফেলেছেন। আমার বাড়ির অনেক সিভিল সার্ভিস হোল্ডাররা তখন রাজবন্দী হিসেবে জেলে। পরবর্তীতে ইন্ডিয়ান আর্মি এসে তাদের শনাক্ত করতে শুরু করে। ইউনাইটেড নেশন এরপরে রেডিও ব্যবস্থা চালু করে, প্রত্যেক সপ্তাহে দুঘন্টার জন্য প্রোগ্রাম হত। আমরা সেইদিনগুলোতে যেতাম। রেডিওর মাধ্যমে খোঁজ নিতাম মামা চাচারা জেলের ভিতরে কেমন আছেন! দুঘন্টা পরে ঐখান থেকে রিপ্লাই আসত। বাড়িতে রেডিও শুনতে শুনতে মা কেঁদে ফেলতেন, এইসব টুকরো স্মৃতির কোলাজ সযতনে রয়ে গেছে ।

আসলে মুক্তিযুদ্ধই আমাদের প্রধানতম মহাকাব্য।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় ভারতীয় বিমানবাহিনীর পক্ষ থেকে হিন্দিভাষায় লেখা পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণের ডাক দেওয়া প্রচারপত্র

PAKISTAN KI FAUJ KE AFSRAN WA NAUJWANO

HATHIYAR DAAL DO!

Kibal iske ke Waqt hath se nikal jaye Hathiar Dal Do

Hindostan ki Fauj yahan pahunch chuki hai - Tumhari Hawai Fauj ka khatma ho chuka nai. Apko hawai imdad nahin mil sakti aur na hi ap kisi hawai jahaz se bahar nikal sakte hain.

Chatagang Chalna aur Mangla men jahazrani band ho chuki hai. Ap na hi behri raste se nikal sakte hain aur na hi apko kumak pahunch sakti hai.

Apki takdir ka faisla ho chuka hai. Mukti Bahini aur Azadi ke Majahdon ne apko charon taraf se gher liya hai. Who apke zulam-o-tashadad ka badla lene ke liye beytab hain. Yeh zulam-o-tashadad apne unke logon par dhae the, who zarur iska badla lenge.

Ab ap ke bachao ka ek hi rasta hai Hindustani Fauj ke samne hathiar dal do. Larai band kar do aur apne hathiar phaink do. Apke bachao ka aur koi chara nahin Ap har taraf se ghire hue hain aur agar jaldi hathiar na dale to buri tarah se mare jao ge.

Keya ap wapas ghar jana chahte hain aur apne bal bachon se milna chahte hain to iske liye ek rasta hai keh Hundustani Fauj ke age hathiar dal do Aur yeh fauran kijiay. Waqt hath se nikal jayega

Ap ki hifazat Hindustani Fauj ke hath men hai hathiar jaldi dal do. Aisa na ho ke waqt hath se nikal jaye. Ab WAQT bilkul nahin.

Ap spahi hain. Spahiyon ko doosre spahiyon ke samne hathiar dalne men koi sharm nahin honi chahiye.

Ap ki hifazat Hindustani Fauj ke spahi karenge.

১৭৭০/১১৭৬ গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার প্রকল্প

জনদানে প্রকল্প পরিচালনা

১। ১৭৭০ এবং...
মিল্টন বিশ্বাস এবং দেবোত্তম চক্রবর্তী সম্পাদিত
অক্ষরযাত্রা প্রকাশনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে 'পলাশীর প্রান্তরে আজ...' শীর্ষকে প্রকাশিত

২। টেগোর ল্যান্ড ঠাকুর কলোনি প্রকল্প
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য এবং শাহজাহান আলি
রবিবাবুর শিক্ষা চিন্তায় উপনিবেশিক ভদ্রবিত্তীয় প্রদূষণ এবং তিনি যে জ্ঞান আর শ্রমের মিলিত শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করেছিলেন নিজের ছেলে আর লক্ষ্মীশ্বর সিংহকে বিদেশে পাঠিয়ে, শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করে, সেই প্রক্রিয়াকে সাবোতাজ করার ইতিহাস আমরা খুঁজছি। নব্য শান্তিনিকেতনি ভাবনাচিন্তার বিরোধিতার কেন্দ্রে আছেন স্যর যদুনাথ সরকার - তিনি ব্রিটিশ আঙ্গিক অনুসরণে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থার গোটা ভাবনাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন। মূলত কয়েকটি বিখ্যাত শান্তিনিকেতনি আশ্রমিক পরিবার রবীন্দ্রনাথকে ঠাকুর বানিয়ে যদুনাথ সরকারের ভাবনাকে সামনে রেখে ভদ্রবিত্ত উপনিবেশিক শিক্ষা কাঠামো শান্তিনিকেতনে চাপিয়ে দিয়েছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নামিয়ে আনার উদ্যম নিয়েছে যাতে তাদের সন্তানেরা চাকরি করার সুযোগ পায়। এক বিখ্যাত পত্রিকা সম্পাদক রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে কেজি টু পিজি প্রকল্প চালু করেছেন এবং এটা ১৯৪১-এর পরে উদ্দাম গতিতে চলেছে, দেশজ মানুষকে উচ্ছেদ করে, তাদের ওপর পরজীবি ভদ্রবিত্তের উপনিবেশ চাপিয়ে দিয়েছে, ঘেটোয় থাকতে বাধ্য করেছে, মিউজিয়ামের মত খোয়াইয়ে হাটে তাদের শোকেস করাচ্ছে। আমাদের কাজ এই সব অভিচারের মূলে পৌঁছনোর।
সময় লাগবে ৮ থেকে ১০ মাস।
আনুমানিক ব্যয় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা

৩। হকার ব্যবস্থা নিয়ে প্রকল্প
গবেষণা নেতৃত্ব বহ্নিহোত্রী হাজরা, অত্রি ভট্টাচার্য
রেল হকার, পথ হকার নিয়ে অনেকগুলো সমীক্ষা। একটা সমীক্ষা অপ্রচলিত পত্রিকায় প্রকাশিত। শক্তিমান ঘোষের সাক্ষাৎকার নেওয়া চলছে। অন্তত ৩টে বই-এর পরিকল্পনা।
সময় ১ বছর
আনুমানিক ব্যয় ২ লক্ষ টাকা

৪। ক্যাডার কয়েদি
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য
স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্রমিকভাবে কেবলমাত্র রাজনৈতিক কর্মীদের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে কোনো সংকলন তৈরী হয়নি। তাই এই সম্পাদিত সংকলনের পরিকল্পনা - যাতে একইসঙ্গে, অনুবাদ, পুনর্মুদ্রণ এবং সাক্ষাৎকার থাকবে। সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য কমিউনিস্ট চিরকালীন অসুখ/সমস্যা/আমলাতন্ত্র, ভদ্রলোকামি, তথাকথিত 'নিচুতলার' কথা না শুনে, নিজেদের কেন্দ্রীয় কমিটির/ পলিটব্যুরোর বক্তব্য চাপিয়ে দেওয়া [গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা], এবং সেই সিদ্ধান্তগুলির পরিণতি হিসাবে বাম-

অবাম-আন্দোলনের অবক্ষয়কে চিহ্নিত করা। সর্বোপরি সিপিআইএম, সিপিআই ও নকশালগোষ্ঠী, ট্রটস্কিপন্থী, গান্ধীবাদী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ'র কিছু জীবিত পুরাতন কর্মীর বয়ান নথিভুক্ত করা- যাতে ক্রনোলজিক্যালি নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিতে নয়, কর্মীদের চোখে বাংলায় বাম-আন্দোলনের ইতিহাসকে- বৈশ্বিক ও জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে আজ পুনরায় বিবেচনা করা এই সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য হবে।

৫। বাংলার সূচি আর বয়ন শিল্পের ইতিহাস
গবেষণা প্রধান কারিগর মহুয়া লাহিড়ী
বাংলার সূচি আর বয়ন শিল্পের ইতিহাস লেখার কাজ নিয়ে এগোচ্ছেন। লেখা এগোচ্ছে। নতুন কিছু সূত্র পেয়েছেন। সেই সূত্রগুলো নিয়ে আরও কাজ করা দরকার। উনি কলকাতা থাকাকালীন একবার দুবার বৈঠক হবে।

৬। বৃহত্তর বাংলার হাট ব্যবস্থা সমীক্ষা
গবেষণা নেতৃত্ব দেবেন বহ্নিহোত্রী হাজরা
কারিগর ব্যবস্থার অবস্থা আর কর্পোরেট আগ্রাসন বুঝতে পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ হাট ব্যবস্থা সমীক্ষা। পশ্চিমবঙ্গের চারটে ভৌগোলিক অঞ্চল রাঢ় বাংলা, গাঙ্গেয় উপত্যকা, মধ্য বঙ্গ এবং তরাই অঞ্চলের মোট ১০টা হাট। বাংলাদেশেরও মোট ১০টা হাট।
সময় অন্তত ১ বছর, হয়ত আরও একটু বেশি
প্রকল্প ব্যয় ১,০০,০০০

৭। মন্দির গবেষকদের কাজের নথিকরণ আর হুগলীর টেরাকোটা মসজিদ মাজার সমীক্ষা
এই মুহূর্তে মন্দির/মাজার গবেষক আছেন, তাদের কাজগুলোকেই নথিকরণ করা হবে।
ইন্দ্রনীল মজুমদারের নেতৃত্ব

দান দেওয়ার জন্যে
জ্ঞানগঞ্জ অছি সবে নথিবদ্ধ হয়েছে, ব্যাঙ্ক-একাউন্ট হয় নি। আপাতত আমরা বন্ধু কারিগর সংগঠন কলাবতী মুদ্রার অছিতে দান নিচ্ছি।

Kalaboti Mudra,
bank of india, J N Road Branch,
A/C - 402620110000228, IFSC - bkid 0004026

হি । র । ণ্য । । এ । কা । ত্ত । র

মৃদুল কুমার বাগচী স্মৃতি পুথিমালা
জ্ঞানগঞ্জ মাসিক পুথি ১৪

ফারসিতে গঞ্জ অর্থে সম্পদ। মুঘল আমলে গঞ্জ খেলা ছিল, আওরঙ্গজেবের ব্যবসায়ী জাহাজের নাম ছিল গঞ্জ কি সওয়ারি। আমরা ছোটলোকের রাজনীতি করারা, পুঁজি বাদ দিয়ে বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থা চালানো মুখমণ্ডলহীনেরা, জ্ঞানকেই সম্পদ মানি। সেই জ্ঞান সূত্রে অর্জন করা দক্ষতাই আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি জীবধারণের ভিত্তি, যে জ্ঞান, যে দক্ষতা চর্মচক্ষে অদৃশ্য, ত্বকে মোড়া হাতে অবাঙমানসগোচর; আমরা যারা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকারা, আমাদের একক কারখানায় উৎপাদনের মধ্যে দিয়ে জ্ঞান আর দক্ষতা অধ্যয়ন করি, ফি বাজারে হাটে নিয়মিত ক্রেতার সামনে পরীক্ষা দিই, প্রতি পরীক্ষার ফল নিজে নিজে তুল্য করে নিজেকে আরও একটু জ্ঞানী, দক্ষ করে কারখানা আর তার পরিবেশ, কাজের পদ্ধতিকে আরও কিছুটা পরিবর্তন করে আবার বাজারে, সমাজের সামনে পরীক্ষা দিতে যাই, জ্ঞান অর্জন করি আলাপের মাধ্যমে - কারিগর হকার চাষীর এ এক অনন্ত শিক্ষা চক্র - জ্ঞানগঞ্জ। জ্ঞানগঞ্জই কারিগর-হকার-চাষী উৎপাদন ব্যবস্থার অক্ষদণ্ড, সে বুকে, মাথায় বাস করে। আমরাই তারই বাহক।

জ্ঞানগঞ্জ, উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা বৌদ্ধিক জ্ঞানচর্চার আকাশ কুসুম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে চাই নি, চেয়েছি চরম বিতর্কিত, প্রায় অনালোচিত বিষয় - উপনিবেশের হাতে তৈরি মুসলমান বিদ্বেষ আজকের বাস্তবতায়, আজকের আলোচনার টেবলে ফেলতে; প্রায় অনালোচ্য ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়ে আলোচনার স্ফুলিঙ্গ তৈরি করতে; উপনিবেশের প্রায় অজানা জেন্ডার ফ্লুইডিটি তুলে ধরে জ্ঞানচর্চায় উপনিবেশিক স্থিতিশীলতা ভাঙতে; হকার কারিগর চাষীদের পরিকল্পনায় দেশজ উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় নিজেদের জড়িয়ে নিতে; উপনিবেশ বিরোধী চর্চায় পূর্ব অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে আমাদের কী কী করা উচিৎ নয় এবং কী করা উচিৎ সে আলোচনা আদিত্য নিগমের সঙ্গে এবং খুনি গণহত্যাকারী ব্রিটিশ উপনিবেশিক রাষ্ট্রনির্মাণ আর তার স্থিতিশীলতা এবং প্যাক্স ব্রিটানিকা প্রকল্পে আর্যতত্ত্ব আর ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা; দেখেছি কিভাবে হোয়াটসেপের মাধ্যমে মিথ-মিথ্যের পাঠক্রম ছড়ায়; একই সঙ্গে দেখছি কিভাবে বাঙালি বুদ্ধিজীবিরা বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে হিটলারের দোসর হয়ে কাজ করে; একই সঙ্গে আমরা বুঝচেয়েছি বাংলার নৌকোকে এবং উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্প বোঝার সম্মেলনের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছি; চলতি সংখ্যায় লুঠেরা গণহত্যাকারী উপনিবেশের অনন্ত লুঠের বাখানকে ধরতে চেয়েছি।

১। টডের তরবারি
২। জি-২০ ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ
৩। আপাতত বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে
৪। হকার চাষী কারিগর ব্যবস্থা
৫। পলাশী থেকে প্যালেস্টাইন
৬। পুথি মুঘল আমলে খোজা - উপনিবেশপূর্ব সময়ের রাষ্ট্র-সমাজে জেন্ডার ফ্লুইডিটি
৭। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)'
৮। হেথা আর্য, হেথা অনার্য: উপনিবেশ দখলে আর্যতত্ত্বের ভূমিকা ও ভদ্রবিত্ত ব্রাহ্মসমাজ
৯। হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়_মিথ ও মিথ্যার পাঠক্রম
১০। নাজি নাগপাশে ভদ্রবিত্ত
১১। বালথাজার সলভিনসের বাঙলার নৌকো
১২। 'দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে' প্রথম সম্মেলন ২, ৩, ৪ মে, ২০২৪ সমীক্ষা
১৩। অনন্ত লুঠের বাখান
১৪। হিরণ্য একাত্তর

জ্ঞা ন গ ঞ্জ